বন্দিনী কথা

রণবীর পুরকায়স্থ

পাকামি কথায় নীতার জুড়ি মেলা ভার। বলে,

--- সকল পুরুষেরেই একটা অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষা থাকে। লেখকেরও ছিল। লোকটা মিচকে। ডুবেডুবে জল খেয়েছে কেউ ধরতে পারেনি। তিনদিক থেকে তিনরকমে উপভোগ করেছে অসহায় নারীকে।

আমাকে নিয়ে লেখা উপন্যাসের নায়িকাকে অসহায় বলায় আপত্তি জানিয়েছি নীরবে। পাত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ায় প্রতিবাদ করেছি সোচ্চার।

--- তিনরকম দেখলি কোথায়? বই- এ আছে দুজন।

আমার সহজ কথায় তাচ্ছিল্যভরা জবাব দিয়েছে বাংলা ভাষার বিদ্যার্থি কন্যা। বলেছে, লেখক বুড়োকে বাদ দিলে? নিজের কোলে ঝোল টেনেছে পাতার পর পাতা। পুরুষ লেখকরা নির্লজ্জ হয়। সুতো লুকোয় না ইচ্ছে করে। তৃতীয় পক্ষে লোকটা ঝাঁকি মেরে দেখেছে আর গিলেছে বন্দিনীর রূপযৌবন। হাড় গোড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল কিন্তু বিক্রমাদিত্য গল্পের শর্ত মানল না।

পাড়াডাকের জেঠু ভ্রমর মিত্রর বয়স তখন ষাট। পিতৃতুল্য বটে। আর একজন আমার স্বামী পঁচিশবছর। অন্যজন যাত্রার পালা লিখত নেতাগিরি করত পাড়ায়। চন্দ্রনাথ বসু ওরফে চাঁদ মামার বয়স চল্লিশ। কেন্দ্রমনি আমার একুশ। নীতা যার কথা লিখছে সে আমি নই হুবহু। সে সীতা। বন্দিনী। লেখক ভ্রমর মিত্রর সাড়া জাগানো উপন্যাসের দুখিনী নায়িকা। বই এর উৎসর্গ পাতায় লেখা ছিল ‘অশোকবনের বন্দিনীকে’। রহস্য দিয়ে ঘেরা। রহস্য না ঘোড়ার ডিম। অশোকবন আর অশোকনগর নিয়ে চালাকি। ভীতু মধ্যবিত্তর প্রতিষ্ঠায় ছাতা টাঙানো থাকে। দিস সাইড আপ। ভঙ্গুর উইথ কেয়ার। সামাজিক জানাজানির ভয়ে স্থান ঘটনা পাত্রের ওলটপালট করে ভালোই করেছে লেখক। নীতা জানতে পারলে রক্ষে থাকত। বিশ্লেষণের নামে

উল্টোপাল্টা বকত। মিতা জানলে ছুটত কথা বলতে। আমার গলা জড়িয়ে বলত, বাও! সিনেমায় রাইটার তোমার আঙ্কল?

জেঠুর লেখা আমি কিছুই পড়িনি। খটোমটো বাংলাভাষায় লেখা কি আর পরতে পারি? গ্রাম বিরাজপুরের মাধ্যমিক ফেল মেয়ে আমি। তিনবারেও পাশ দিতে পারিনি। তবু ফুটেছিল ফুল, হয়েছিল বিয়ে। পাতিপুকুর দক্ষিণপাড়ার মুদি রাধারমণ বণিকের কনিষ্ঠ পুত্র দীপকচন্দ্রের সঙ্গে। শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত বণিকবাড়ির তির্যক বর্ণনায় আবার নীতার প্রশংসা লেখকের প্রতি। অতি উৎসাহে পড়ে শোনায় যখন তখন,

‘পাঠক উহাদের মুদি বলিয়া ফেলা করিও না। হাতির দেখানোর দাঁতে আড়াইশ গ্রাম মশুর ডাল পঞ্চাশ পাঁচ ফোড়ন আর লিটার মাপের কষ্টঘানির তৈল থাকিলেও চিবানোর দাঁত ভিন্ন। আঢেল সোনাদানা নগদের তেজারতি। মুদিখানার মলাটে শুধু পিতৃ আজ্ঞাকারী দুই যুবক ভ্রাতার সহাস চিত্র। যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠসমাপ্তির ঘণ্টা বাজিয়াছিল ঢং ঢং। অধিক শিক্ষায় বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা। বিদ্যার্জন থেকে ধনার্জন অধিক কার্যকরী। বণিক পিতা তাই অনতিবিলম্বে মুদিমসনদের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন রামলক্ষ্মণ দুইপুত্রকে। বংশরক্ষার মানসে বিবাহও সম্পন্ন হয় বয়স না হইতে বিংশতি বৎসর। দেব জন্মাতে দেবী যেমন প্যাঁচা জন্মাতে পেঁচিরও জন্ম হয় যথা কালে যথাস্থানে।’

লেখকের উপমা বণিক বাড়ির প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ। ওরা যাই হোক আমাকে কেন টেনে আনা। আমিও দীপকচন্দ্র কোনো প্যাঁচাপেঁচি ছিলাম না। সুঠাম শরীর আমার স্বামীর গুণ ছিল। ভালোবাসতে জানত। ডাব নারকেলের শাঁস ছিল মনে। মা বাপের মোরামনুড়িতে নরম মনে চড়া পড়েছিল। আমার মেয়ে নীতা যতই পুরুষ বিদ্বেষী হোক বাপের চরিত্র ধরতে পেরেছে সঠিক। উপন্যাস মধ্যবর্তী অলিখিত বার্তা ধরে লেখককে শাসন করেছে নির্মমতায়। বলেছে,

--- অসহায় পুরুষকে অকর্মণ্য অত্যাচারী এমনকি পুনর্বিবাহ করিয়েও রেহাই পেল লেখক?

--- কে কাকে রেহাই দেয় রে মেয়ে?

নীতার ডেঁপোমি আমার ভালো লাগে নি, কতটুকু জানে সে পাত্রপাত্রীকে। কেন এত ফটরফটর। কখনও নারীবাদী কখনও পিতৃবাদী পুনর্বিবাহে লেখকের কোনো কেরামতি নেই। দীপকচন্দ্র মা বাপের কথায় লোভের নাড়ু খেয়েছে। অন্যায় করেছে। শাস্তিও পেয়েছে হাতে গরম। পুড়ে মরেছে।

ভালোবেসেছে গান গেয়েছে দিয়েছে অনেক কিছু। ফুটফুটে দুটো মেয়ে দিয়েছে। সুখের সংসার পেতেছে সংগোপনে। স্বামী হয়ে স্বামী পরিত্যক্তার ঘরে পরপুরুষের মতো রাতে এসে সকালে চলে গেছে। মেয়েদের জন্য খেলনা জামাজুতা এনেছে, আমার জন্য ঝলমলানো শাড়ি গয়না। বাপ ভাইকে লুকিয়ে বাড়ি ব্যবসা অশোকনগরে। চাঁদমামার জন্যও কিছু না কিছু। দীপকচন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস আমার দৌবারিকের উপর! বলে, ওকে মোগল বাদশার কাছ থেকে ধরে এনেছি। বলে, ও আবার একটা মানুষ!

গুপ্তপ্রেম আর গুপ্তধন দুটোই বেওয়ারিশ। পতিধন আর পতিপ্রেম প্রমাণ নেই কোথাও। নিজের বউকে যে এত ধন সম্পত্তি দিয়েছে বলার সাহস ছিল না মানুষটার। তাই সবাই জেনেছে নারী গড়েছে সাম্রাজ্য। স্বামীহীনা রমণীর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির দিকে ফিরেও তাকায়নি। দীপকচন্দ্র যে লোভী ছিল। মাশুল দিয়েছে। গাছের খেয়ে তলার কুড়োতে আসত আমার কাছে। ফ্রিতে দিই নি। সব নিয়েছি।

গ্রামের মেয়ে হয়েছি নারী প্রগতিবাদী। আটপৌরে ছেড়ে কুঁচি দেওয়া শাড়ি পরতে শিখেছি। কথা শিখেছি ফটর ফটর নীতার কাছে। নীতাই আবার বলে, তোমার গ্রামের ভাষাই ছিলো ভালো। বলে, শহুরে কথা মানুষকে মিথ্যাবাদী করে। মিথ্যে কী সত্যি জানি না তবে মেপে জোখে কথা বলি।

ছাপা কথায় আমার ভীতি ছিল বরাবর। বাংলায় লাড্ডু পেতাম যে। বিয়ের পর দীপকচন্দ্র শুনিয়েছিল ক্যাসেটের গান। তুমি তখন একুশ বছর বোধহয় আমি তখন অষ্টাদশী ছোঁয়া। টু-ইন ওয়ান ওয়ালাও বাংলা ভাষার কবিরাজ। ক লিখতে কালোজিরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়। অষ্টাদশী কথার মানে জেনেছিল লেখকের কাছে। মুদিখানার খদ্দের লেখককে নিমন্ত্রণ করেছিল মেয়ের মুখে ভাতে। দীপান্বিতা পারমিতা নামও রেখেছিল ভ্রমর জেঠু। ঝুলিওয়ালা ঠাকুরদাদা হয়েছিল আমার মেয়েদের।

উপকথা আর কিচ্ছাগল্পের রাক্ষুসে ঠাকুরদা ঠাকুমার কাছ থেকে আদর সোহাগ পায়নি নীতা মিতা। টাকা আনা পয়সা হিসেবের বাড়িতে মেয়ে জন্মানোয় মুখ ভার। একের পিঠে এক বছর ঘুরতে না ঘুরতে। তাদের আবার মুখেপসাদ। গৃহকর্তার অনিচ্ছায় হয়েছিল এক একটা নমনম। আমি তো ছিলাম ওদের ঘুটেকুড়ুনি বৌ। দুয়োরানীর উপর অত্যাচার নিয়ে লড়েছিল লেখকজেঠু। সংবাদ পত্রে কলাম লিখেছিল। রাজনৈতিক নেতা চাঁদমামাকে জুড়ে দিয়েছিল। গল্পের রসদ তৈরি করেছিল সালিসি ডেকে। সবই হয়েছিল বাজারের নিয়ম মেনে। উৎপাদিত হ্যেচ্ছিল রোমহর্ষক উপন্যাস। একলা প্রোডাক্টে বাজার চলে না তাই হয়েছিল সুপারহিট সিনেমাও।

বন্দিনীকে আমার দুই মেয়ে দেখেছে দুই চোখে। দুরকম নির্যাস। নরম ও গরম। নীতা বুদ্ধিমতী, বিশ্লেষণে প্রখর ও তির্যক। বলে, নারী নির্যাতন আর দাঙ্গার ভাষা এক। প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারি। ঘর হোক মন হোক ভাঙা জিনিস ফিরে আসে না অবিকল। বলে, দেশভাগ যারা দেখেছে, হারিয়েছে স্বজন ও ভূমি, তারা হয়েছে লাদেন হয়েছে তোগাড়িয়া। কেউ আবার ধর্মহীন দুনিয়াদার। কমিউনিস্ট। এক নির্বিকল্প ভ্রাতৃত্ব। বন্দিনী লাদেন হয়েছে বেশ করেছে। ঘর দোর স্বামী সতিনকে পুড়িয়ে মেরেছে। আর তুমি পড়ে পড়ে মার খেয়েছ।

পড়ে পড়ে মার খাওয়া শুধু কথার কথাই নয় নীতার কাছে। বন্দিনী পাঠের প্রতিতুলনায় গর্বিত সন্তানের শ্রদ্ধার্ঘ্য বটে। মেয়ে জানে তার মা নির্যাতন ভোগ করেছে বিস্তর। পিতার অকাল মৃত্যুতেও ভেঙে পড়েনি। সামলে নিয়েছে প্রতিকূল পরিবেশ। সমাজের নাকে দড়ি দিয়ে আদায় করেছে অধিকার। তাইতো বলে, কেন পড়ব? জীবন্ত প্রতিবাদ ছেড়ে কেন মন খারাপ করব কল্পনার বদহজমে। বলে, তোমার জীবন নিয়েও লেখা হতে পারে মহত্তর উপন্যাস।

আসলে বন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর ছিলাম বিভ্রান্ত। জীবনের চেয়ে বড়ো মাপে গড়েছিলাম নিজেকে। স্কুল পড়ার সঙ্গে মাকেও পড়তে শিখেছিল দুইমেয়ে। ভয় পেয়েছিলাম সত্যের চাপে যদি চুরমার হয়ে যায় আমার উপার্জন, আমার সন্তান। কোনও ঝুঁকি নিইনি, কুয়াশা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি অতীত। তৈরি করেছি এক আলোকিত উত্তারাধিকার। সত্য নয়, উপন্যাস নয়, সিনেমাও নয় আমার নিম্নগামী অধিকার। সে আমার জীবন, বেঁচে থাকার রসদ, আমার জননীগর্ব। অন্ধকার মুছতে মুছতে নীতার বিশ্লেষণেও ঢুকিয়ে দিয়েছি বিভ্রান্তি। কথার মিথ্যে আর কথাকারের সাজানো রহস্যকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে প্ররোচিত করেছি। বলেছি,

--- তুই তো পাঠক। তোর কী দায় সাজানো জিনিসকে নতুন করে সাজানোর, এত বিশ্লেষণের?

--- ভুল সত্য কখনও সত্য হয় না মা। পাঠক যে সত্য চায়।

--- সত্য কোথাও পাবি না। অক্ষর খুঁজে সত্য পাওয়া যায় না। সত্যের মতো হয়।

--- প্রতীত সত্যও সত্য একশো ভাগ।

আমার মেয়ে সত্য সাজায় সিমেন্ট পলেস্তারা দেয় ধারে এবং ভারে কাটার মতো ইটপাথরে। বলে,

--- সত্য ন জীর্যতি ন মমার। সত্য সিকা কোম্পানির অটুট ক্যামিকেল।

শ্রোতা অবাধ্য হলে নীতার ধৈর্য থাকে না। শক্ত কথা বলে বোঝা বাড়িয়ে দেয়। কথায় তখন নোনা ধরে জরাজরা। যেমন দেশভাগের তুলনা। কল্পনায় মেরে দিয়েছে। হয়তো বই এ পড়েছে। মাকে প্রভাবিত করতে লাগিয়ে দিল। দেশভাগ না হলেও দাঙ্গার আঁচ একটা পেয়েছে সদ্য সদ্য। গুরজারট নিয়ে মিটিং মিছিল করেছে। বলেছে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকলে মানুষের শত্রু জন্তুদের পুড়িয়ে মারত জ্বলন্ত ট্রেনের কামরায় আবার।

আবেগ ঝড়ে বলে ফেলেছে। নীতা কখনও মানুষ মারতে পারে না। আমি মা, জানি আমার মেয়েকে। বলেছি আবেগ কখনও জীবন নয়। সত্য নয়। সত্যের আভাসও নয়। জোনাকির আলো দেখতে ভালো বলে কি কেউ কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করেছে। বারণ করেছি আবেগতাড়িত হতে। পুড়িয়ে মারার মতো নিষ্ঠুর কল্পনা কেন করবে মেয়ে হয়ে। স্বামী সতিনকে যে পুড়ে মরতে দেখেছি আমি।

আমার ছুটকিকে নিয়ে সমস্যা নেই, বাপের মতো নির্বিবোধী। দিদির মতো আগুনের ফুলকি নয়। নারী অধিকারে মৌলবাদী পুরুষ বিদ্বেষী নয়। মিতা বলে,

--- বন্দিনীর পরিচালন পদ্ধতিতে ভুল ছিল। সিধে সরল স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে পারত। সতিনকাঁটার চোখের বালি নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারত জীবন। খুন খারাবি, জেল পাগলাগারদের এড়াতে পারত। ভালো তো বাসত বরকে।

নীতা থামিয়ে দেয় বোনকে। বলে,

--- এ বর সে বর নয় খুকি। এ যে দোজবর। পারত না বন্দিনী তুইও পারবি না। আমি তো জানি তোর স্পেসিফিকেশন। এনে দেব বটতলা আর বাংলাবাজারের সেরাটি।

বড়বোন খুনসুটিতে শ্লেষ মাখিয়ে শোনায় বিখ্যাত ছড়া,

মাটির ঢিবির মতো হবে বর

কথা নাহি কবে কথার উপর

যেদিকে ফিরাব সেদিকে ফিরিবে।

লাথি মারিলেও চরণ ধরিবে'।

সূঁচফোঁড়ের কাজ জানতাম আমিও গ্রামীণ ছড়া সেলাই করতাম কাপড়ে। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' ফ্রেম বাঁধিয়ে দেখিয়েছিলাম শ্বশুরকে। ওয়ার্ক এডুকেশনের গুণেই বিয়েটা হয়। কপাল দোষে ছারে খারে গেলেও আমার মেয়ের যাবে না।

তালে গোলে মাটির ঢিবি দীপকচন্দ্র ভিলেন হয়ে গেল। আবার বিয়ে করল যে! নইলে স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই আমার ছিল না। কুচক্রী লেখক উসকে দিয়েছে। বলেছে নিষ্ক্রিয়তাও একধরণের নির্যাতন।

নীতাও বলেছে লেখক যদি সুখের কথাই লিখল তবে পড়বে কে? সংঘাত চাই, ধারাবাহিক দুঃখের দোকান খুলতে হয়। মীনাকুমারী গড়তে হয়। নইলে পাঠক খায় না। মেয়ে বলেছে নারীর মন কোনোদিন বুঝতে পারেনি কোনও বিপরীত লিঙ্গ লেখক। রক্ত মাংস মন দিয়ে নারী গড়েনি কেউ। দুঃখ দিয়ে মহীয়সী গড়া হয়েছে। দয়া দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট সহিষ্ণুর আর এক নাম নারী। রবিঠাকুরও বলেছেন হায়রে!

আমি ওরকম নই। নীতাকে বলেছি জানি না তোর বই এ কী আছে। তবে শুরুতেই আমি জেনে গেছি বউজীবন আর চটকল চাকরি একই রকম। কোনও স্থায়িত্ব নেই। পরের পয়সায় নির্ভর। তিন তালাক বললেই ফক্কা। তাই কোনও সুযোগ দিই নি। নিজের ভাগ্য নিজেই

গড়েছি। নীতা ভারিক্কি চালে বলেছে, তুমি আর বন্দিনী আলাদা। গ্রামের মেয়ে পড়াশুনা করেনি। আমি বলেছি তাতে কী? প্রতিবাদ তো করেছে। স্বামী হত্যার দায় অস্বীকার করেনি।

নীতা জেনে শুনে ভুল করল? সে জানে আমিও গ্রামের মেয়ে। চাঁদমামার পরামর্শ মতো গ্রাম বিরাজপুরের নাম বিলিনি। বলিনি পাতিপুকুর দক্ষিণপাড়ার কথাও। বললেই কৌতূহল। তাই বলেছি সবার যেমন থাকে আমারও ছিল একটা বাপের খাঁচা। একটু বড়সড়। আকাশ আকাশ ভাব ছিল। স্বামীটারও আঁটো। দুয়ার আঁটা।

আমার বাপের বুকে ছিল সত্যিকারের আকাশ। উড়ে বেড়িয়েছি নীলে। পরীক্ষা দিয়েছি। ফেল করেছি বাবা বলেছে এত পাশ দিয়ে কী হবে? বলেছে জয়রাধে শ্রী রাধে। বাবার ছিল কীর্তনের সম্প্রদায়। হারমোনিয়াম খোল করতাল। দূর গাঁয়ের মানুষ বায়না করতে আসত। বাবার নামে হ্যান্ডবিল ছাপা থাকত। শ্রাদ্ধ গৃহপ্রবেশ এবং অষ্টপ্রহর কীর্তনে অংশগ্রহণ করিয়া থাকি। সাংঃ গ্রাম বিরাজপুর। বাবার সম্মান ছিল অর্থ ছিল না। গ্রামের মুদিখানার আয়ে চলত সংসার। বড়োলোক দেখে শ্বশুরবাড়িতে দিয়েছিল মেয়ের বিয়ে। তেজারতি কারবারির সঙ্গে লড়তে গেছিল জয়রাধে শ্রীরাধে কীর্তনিয়া। মরেছিল পাটের দড়িতে।

নীতা বলে, বন্দিনীর বাপটা কাপুরুষ, স্বার্থপর। অর্থলোভে মেয়েকে বেঁচে দিল। আমি বলি, না। বাবার লোভ ছিল না। মানুষটার জীবনে সন্তানই ছিল সম্বল। মেয়ের কষ্টে দিশেহারা হয়েছিল। সমাধান খুঁজে পায়নি বলে নেতা ধরেছিল। ভ্রমর মিত্র চাণক্যর শরণাপন্ন হয়েছিল। শিষ্য চন্দ্রগুপ্তও তখন দাপুটে নেতা চন্দ্রনাথ ওরফে চাঁদমামা। হয়েছিল অভিনব সিমলাচুক্তি। সাময়িক শান্তি সমাধান। দীপকচন্দ্র বউ মেয়ে নিয়ে আলাদা থাকবে কিছুদিন। ডামাডোলের মধ্যেই চাঁদমামা রচে দিল আমার জীবনের দূর। দীপকচন্দ্রকে এত দূর অশোকনগর বাড়িটার খবর দিল। ভালো মানুষ স্বামী বলেছিল, অনেক দূর যে। ভেবেছিল নিয়মরক্ষার কাছাকাছির কোথাও দুদিন কাটিয়ে আবার ঢুকে যাবে একান্নবর্তী সংসারে। মায়ের আঁচলে। কারণ সে ছিল একটি পিত্তিহীন মানুষ। মন অপমান গায়ে মাখত না। বাপমাকে ভয় করত। আমাকেও ভালোবাসত। আমি না আমার শরীর কে জানে।

নতুন বাড়িতে এসে মাটির টানে আমিও কিছুদিন ভুলে রইলাম আমার বিড়ম্বনার ইতিহাস। গাছগাছালির পাখপাখালি আর আকাশভরতি রং মিলান্তির খেলায় মাতোয়ারা হয়ে

গেলাম। ভুলব না কখনও আমাদের সেই পঞ্চবটী বাসের সুখস্মৃতি। রামচন্দ্র ভোরবেলা বেরিয়ে যেত পাতিপুকুর পিত্রালয়ে। ফিরত যখন রাত করে যত্ন আদরের বন্যায় টইটুম্বুর উপচে পড়ত এইটুকুনির বাসভূমি। দুদিনের সুখ তিনদিনেই ফুরিয়ে গেল। আর ফিরল না দীপকচন্দ্র রেলগাড়ি ঝমঝমিয়ে। কিসব কাগজপত্র নিয়ে এল একদিন চাঁদমামা। বলল বিচ্ছেদ। সেদিন হাত পাকিয়েছিলাম, মেরেচ্ছিলাম থাপ্পড় হাট্টাগাট্টা মানুষটার গালে। পর রমণীর চড় থাপ্পড়ে কী নির্ভরতা পেয়েছিল কে জানে। চাঁদমামা পাকপাকি চলে এলো অশোকনগর। নেতাগিরি শিকেয় তুলে বলল এবার পালা লিখবে আমাকে নিয়ে।

নীতা বলে, পলিটিশিয়ান চরিত্রটা দারুণ লিখেছে রাইটার। নেতা ইজ নেতা। কবিতা লিখলেই চরিত্র পালটে যায় না। দুতিনজন কবি সাহিত্যিকও এদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীও আছেন। তাতে কি কিছু পালটায়, প্লোটো স্যারের মতো নয় দেশদুনিয়া। বুদ্ধি আছে বলেই ওঁরা টপে। ভোটের পাবলিকে খাওয়ানো যায় ইমেজ। এই লোকটাও কেমন বুদ্ধি দিয়ে বন্দিনীকে নিয়ে গেল অতলে। নকল হম্বিতম্বি দেখালেও প্রথমদিকে কাজ করত বণিক বাড়ির। তবে এক থাপ্পড়ে আনুগত্য বদলে যাওয়ার তাড়াহুড়োও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নইলে একা নারীর পক্ষী সম্ভব ছিল না এতসবে জড়িয়ে পড়ার। লেখায় কিন্তু কোথাও প্রকট নয় চাঁদমামার অপরাধী চরিত্র। ওখানেই লেখকের দুরভিসন্ধি। নারী চরিত্রে দাগ লাগিয়ে দেওয়া। বন্দিনীর লোভী বাপকে দিয়েই তো করানো যেত। ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল। মেয়ের নামে বাড়ি ব্যবসা আর কী চাই। দখল নিলেই হল।

আমি বলি মিথ্যে। একদানা সত্য তোর কথায়। বাবা রাধারানির শ্রীচরণ ছাড়া মাথা নোয়ায় নি কোথাও। অভিমানী মানুষটা তবু আমার শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়েছিল। সেই দুখেই বাবা চলে গেল। সাধারণ মানুষ প্রতিশোধ নিতে পারে না। মনের দুঃখে, অপমানে আত্মহত্যা করে। বাবার মেয়ে হলেও বাবার মতো সরল সোজা মানুষ নই আমি। আমি লিডার ধরেছি। দাবার দান সাজিয়ে চাল চেলেছি। অক্ষমের মতো মরে যাইনি।

ঠাণ্ডামতির মেয়ে আমার মিতাও এক চাল দিয়ে আধঘণ্টা বসে থাকার খেলা পছন্দ করে না। বলে, পোলিটিশিয়ান কী করবে। এখন সব ডলবি ডিজিটাল। ঢিসুম ঢিসুম। এদিক মারলে ওদিক কান ফাটাফাটি। পাতি লিডারের কম্পো নয়। শ্বশুর ভাসুর টাইট হয়ে যাবে পোসেনজিতের ডায়লগ আর এক রদ্দায়।

শ্বশুরকে নিয়ে সমস্যা ছিল না। দুদিকে দুই নাতনি নিয়ে বুড়ো সুখেই ছিল। তানিমানি ডেকে আদর করত। ভুলে যেত পাওনাগণ্ডার গরমিল। মনে করিয়ে দিত নারীশত্রু। রমণীর শত্রু মেয়েমানুষ হলে রোধে কার শক্তি। বাচ্চা দুটো বুকের দুধ পায়নি বেশিদিন। ডাক্তার বলেছে অপুষ্টি। বলেছে কৌটোর দুধ দিতে। কিনে দিয়েছে শাশুড়ি। হাড়জ্বালানো কথাও শুনিয়েছে। বলেছে, বাচ্চা খায় মাও খায়। এমন অপবাদ। আমি ফোঁস করেছি, রেগেছি। আবাগির বেটিকে মেরে ফেলার ইচ্চে হয়েছে। ইচ্ছে দমিয়ে রেখেছি আরও কুকথা শোনার জন্য। বলেছে, হাভাতের মেয়ে। বলেছে অলক্ষ্মী। শুধু মেয়ে বিয়োয়। স্থির করেছি শাস্তি দিতে হবে। মেরে ফেলা তো শাস্তি নয়, হেরে যাওয়া, আত্মসমর্পণ করা।

নীতা অবাক চোখে চেয়েছে আমার দিকে। বলেছে, এমন অসংলগ্ন কথা তো আছে বই –এ। কখনও বলেছে মেরে ফেলা শাস্তি নয় কখনও মেরেই ফেলছে।

ধরা পড়ে যাওয়ার ভান পর্যন্ত করিনি। বলেছি, কী রকম কথা আছে! পড় না। শুনি। নীতা পড়ে শুনিয়েছে।

‘হাড় জিরজিরে দেহের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোটরগত চক্ষু সীতারানীর। দ্বিতীয় পোয়াতি জননীর চোখে জলের ধারা পড়ার আগেই শুকিয়ে যায়। চোখের কালি পঞ্চসায়রের ঝামাপাথর বেদীর মতো শুকনো, খটখটে। মাতৃত্ব গভীর হয়ে টালটলায়মান দিঘির জলে বিস্তৃত করছে মায়া। স্নেহের বারি নষ্ট করতে চায় না মাতৃকা। বুকের সম্পদে যে আর ভাগ পায় না সন্তান। গোত্রাধিকারী পিতা দেখেও দেখে না দুঃখ। বুঝেও বোঝে না নবীনা জননীর মর্মবেদনা। মুসামিলেবু আর সেরেলাকের জীবনদায়ী আবেদনে গৃহকর্ত্রীর কটাক্ষ দরিদ্র পিত্রালয়ের প্রতি। অসহায় মাতৃমূর্তির নয়নজলে লাগে জোয়ার। চুষ কাগজের চোখের কালিতে কোটাল মরেও যায় নিমিষে। জল মরে ঠিকরে বেরয় আগুন!’

চোখের জল এত সস্তা! আমার দুঃখের কাঁদুনি কারও কাছে গাইনি। সব মিথ্যে। ছি ছি ছি। বুকের দুধ নিয়ে বলব ভ্রমর মিত্র পরপুরুষকে। মরে গেলেও না। লেখকের চোরা চোখ জরিপ করলে কী করতে পারি। পোয়াতি বুকের আকর্ষণে মজেছিল বুড়ো। কিছু তো লাই দিয়েছি। পেখম মেলেছি পরোপকারী বন্ধুর নয়নসুখের জন্য। সেই মানুষটাই কেমন বদলে গেল। জড়িয়ে গেল মিথ্যার জালে। উপন্যাসে লিখে বদলা নিল অক্ষমতার। দীপকচন্দ্রের সস্ত্রীক

পুড়ে মরার সঙ্গে জড়িয়ে দিল আমাকে। সংশোধনাগার থেকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিল বন্দিনীকে। রাজনীতি প্রশাসনের সকল স্তরে যাতায়াত ছিল তবু তো অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজের গুলি থেকে বাঁচতে পারল না। নীতার কথাই ঠিক, লোকটা বিক্রমাদিত্য গল্পের শর্ত মানে নি।

লেখকের মতো উগ্রদৃষ্টি ছিল না চাঁদমামার। আমার পূজারী হয়েই কাটিয়ে দিল অপদার্থ জীবন। ভ্রমর জেঠুর সৃষ্টি করে পাঠিয়েছিল আমার কাছে। আমি চেয়েছি বলে লেখককেই হালুম করেছে চাঁদমামা।

সিনেমায় তো আবার ওই মাঝবয়সি লোকটাকে নায়ক বানিয়ে দিল। মিতার ভালো লেগেছে। বলেছে, লোকটার সঙ্গে ট্যুইস্ট দেখিয়েছে দারুণ। বন্দিনীর সঙ্গে ড্রিম সিনটা বাস্তবের সঙ্গে মিলেছে। সত্য আর সত্যভ্রম। গজা গুজিয়া কটকটি আর লালমোহন মিষ্টি পান্তুয়া খেতে খেতে গাইল দুপুরবেলার হলুদ রোদে ভেজার গান।

দুপুরবেলাই আসত চাঁদমামা। পার্টির লোক বলে ভয় করত শাশুড়ি। থালাভর্তি সস্তার মিষ্টি পাঠাত আমার হাত দিয়ে। চা করে দিতাম। চলে গেলে বুড়োবুড়ির কটাক্ষে পিত্ত জ্বলে যেত। বুঝতাম জাল ছড়াচ্ছে। তাও গল্প করতাম সাদা মনে। আমার বোকামিতে দাগ লেগে গেল সতীত্ব। ওরা আক্রমণে গেল। বলল, ছি। বলল আবার বিয়ে দেবে। আমিও মরিয়া। চাঁদমামা তখন সত্যিকারের হিরো আমার কাছে। সমাজসেবা করে যাত্রাগানের পালা লেখে। গলার কারুকাজ দিয়ে শোনায় পয়ার ছন্দের ডায়লগ। বীররসের হুঙ্কারে থাকে অবিচারের প্রতিকার। ম্যারাপ বাঁধা সভাসমিতিতে দেয় জ্বালাময়ী ভাষণ। ভালো লাগত। আমাকে বলত ভাষণ দেওয়া শিখিয়ে দেবে। বলত ভয় পেলে চলবে না ভেড়া ছাগল বলে চারিয়ে যেতে হবে। কথার মিষ্টিতে গজা গুজিয়া নয় বড়বড় রাজভোগ রসগোল্লা দিলেই মুহুর্মুহু হাততালি। গ্রামের মেয়ে পারিনি। তাই ভোটে দাঁড়াইনি। কাউন্সিলার হইনি। ওসব সিনেমায় দেখিয়েছে। সিনেমা তো আর সত্য নয়। একার সত্য বহুজনের জন্য সাজাতে গোঁজ দিতে হয় এটা ওটা।

নীতা বলে সিনেমায় চোখকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জোড়াতালি দেওয়া যায়। রহস্য সাজানো যায়। কামগন্ধে ম ম করা শরীর দোকানের খদ্দের করে সুখের শীৎকার করা যায় ওপস্। অসহায় লেখককে অতিক্রম করে যায় পরিচালক। সিনেমার বন্দিনীকে লাস্যময়ী করায় নীতার

রাগ। আমি সুন্দরী ছিলাম। আগুন ছিল। নইলে কেন এত পাখি ওড়ে। ফিগার ছিল লোভনীয়। অপুষ্টির জন্য বেতলতা। মিতাও বলেছে বন্দিনীর হিরোইন কী ঝিঙ্কু।

মিতা বইটই পড়ে না। গান শোনে হাই ভলিউমে। সিনেমা দেখে বাংলা হিন্দি। টিভিতে চোখ লাগিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। মিতা দিদির মতো নারী প্রগতিবাদী নয়। পুরুষমাত্রই শত্রু ভাবে না। বন্দিনী দেখে বলেছে একটা বেদের মেয়ে ডুপ্লিকেট থাকলে ফাটিয়ে দিত। শ্বশুরবাড়ি বুঝতে পারত না কোনটা আসল কোনটা নকল। হেভি ঝাড় হত।

আমার মধ্যে একটা যমজ সত্তা ছিল। বিদ্রোহ করত। পতিপুকুর থেকে যেদিন বাড়ি ছাড়া করল, কাঙালের ধন কয়েক ভরি সোনাও যখন শ্বশুর কেড়ে নিল, তখন ঝাড়ের হাত উথিয়েও পারিনি। বাঙালি মেয়ের সহজাত কোমলতা পিছু টেনেছিল। সিনেমায় ওই দৃশ্যটা ছিল। শ্বশুর বউএর হেভি ঝাড়পিট। স্বপ্নে কল্পনায় বন্দিনী হয়ে উঠেছিল লায়লা আলি। মেরেছিল মুড়কর। মিতা ওসব ডিটেলস দেখে না। বলে, ছিল নাকি ওরকম সিন। আমি অর্ধেকই দেখিনি, এমন প্যানপানানি।

নীতার চকচকে আগুনে চোখ দেখে ভয় হয় আমার। বলে, ওটাই ঠিক। স্বপ্ন দৃশ্য না হয়ে সত্য হলে সিনেমা ওখানেই থেমে যেত। সবার ভালো লাগত। সত্য দেখাতে তিনঘণ্টা লাগের না। ঠান ইট না হলে উপন্যাস হয় না তত্ত্বও এখন অচল। সতেরো পাতায় উপন্যাস লিখে দেখিয়ে দিয়েছেন দেবেশ রায় লেখক। সিনেমার শক্তি আরও বেশি। নীতা সবসময় বেয়াড়া কথায় নিয়ে যায় আলোচনা। মানিয়ে চলতে পারে না।

ছোটবোন মিতার সঙ্গে তুলনা করলেও রেগে যায় আমার বড়কি। বলে, হ্যাঁ, সিনেমার ভ্যাবলা হিরোকে স্বপ্ন দেখলেই ভালো মেয়ে হয়। পাড়ার চুনুকে জানেমন প্রাণেশ্বর লিখে পত্র লিখলে মেয়ের মতো মেয়ে হয়। বলে, এত পুরুষ পুরুষ করে কেন তোমার মেয়ে। আদর্শ নারী হতে চায়। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার জন্য? ছোটবোনকে শুনিয়ে বিদ্রুপের ছড়া কাটে---

‘সীতার ন্যায় সতী হব

রামের ন্যায় পতি পাব

লক্ষণের ন্যায় দেবর পাব

দশরথের ন্যায় শ্বশুর পাব

এবং ফলনা ফলনা হব।’

বলেই মারে কূট, মাইফুট!

আমি বলি, কেন পাবে না। আমি পাইনি আমার মেয়ে পাবে।

দেওর পাইনি ভাসুর পেয়েছিলাম। ভালোই ছিল, ভাইকে সামলে রাখত। ভাই-এর মন বুঝতে পারেনি কোনোদিন। বুঝলে কী আর অনর্থের রামায়ণ হত। দীপকচন্দ্র আমাকে নির্বাসন দিতে চায়নি। ঘর করতে চেয়েছিল সুখে। স্বামী অশোক নগরে এসে থাকতে শুরু করায় বিপত্তি। ভাইএর গলা জড়িয়ে বলল, ভাই আমার কথা ভাবলি না একবারও। চলে এলি?

আমি বলেছিলাম, তুমি ভেবেছ?

নীতা বলেছে, ‘বউ গেলে বউ পাইব কিন্তু আমার ভাই---গেলে আর তো পাইব না’ তত্ত্বে ভর করে লেখক বন্দিনীর ভর্তৃকা চরিত্রে দূরত্ব রচনা করলেন। হায় পুরুষ। সেদিন আমার কথায় ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস প্রলয় অকস্মাৎ। দুইভাই চলে গেল গলাগলি। দাদা গেল ভাই গেল। চাঁদমামা রাজনীতি শেষ হয়েও হইল না শেষ। স্বামী পরিত্যক্তা আমার সমান্তরাল সংসারের ব্যবস্থাপক একদিন বলল, যাই পাতিপুকুর। বিয়ে খেয়ে আসি। দীপকচন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়ের বরযাত্রী হতে চাঁদমামা গেল টুকটুকিয়ে। ফিরে এসে বলল, এবার জমবে পালা। দুপুরবেলা গজা গুজিয়া পান্তুয়া খেতে খেতে বলল ঘনা ফটিক বিল্টুদের কথা। যারা এককালে ভোটে জিতিয়েছে তাদের আবার সংগঠিত করবে প্রাক্তন নেতা। তার সংগঠন জোরদার করতে চাই প্রয়োজনীয় রেস্ত।

টাকা নিয়ে পাতিপুকুর যাওয়ার আগে চাঁদমামা শুনিয়ে গেল বিশদ। বলল ওরা নাকি খাইয়েছে তোলা। চাণক্য গুরু এই বয়সেও চারখানা ফিসফ্রাই সাঁটিয়েছে। চুকচক দুঃখ করেছে আমার জন্য। মুরগির লেগপিস চুষতে চুষতে বলেছে, একটা বিহিত করতে হবে। বিহিত না ঘোড়ার ডিম, বণিক দোকানের চালডাল নুন খেয়ে বেঁচে আছে না! তাই শেষপাতে আইসক্রিম খেতে খেতে মত বদলেছে। পালটি খেয়েছে পরোপকারী লেখক। বলেছে, ওসব ওদের ফ্যামিলি ড্রামা।

নীতা বলেছে, সেলিব্রিটিরা কখনও মানুষ হয় না। নিজের ছাড়া কারও উপকারে লাগে না। ওরা দুধ কফি খায়। টেবিল চাপড়ে প্রতিবাদ করে। ভালো থেকে আরও ভালো সেজে থাকে। পেয়ারা গাছের ডাল। চাপ নেওয়ার জোড় নেই। লেখক তো আরও ভীতু। কাগজ কলমেও ভার নিতে পারে না। চোখে দেখে না ক্রান্তদর্শী হওয়ার ভান করে। দুম করে একটা মানুষের আবার বিয়ে দিয়ে দিল। প্রস্তুতিহীন দ্বিতীয় শ্রেণির লেখক না হলে হয় এমন দুরভিসন্ধি। লোকটা শর্টকাট করেছে। পরপর ঘটিয়েছে সংঘাত। আগুন মৃত্যু জেলখানা পাগলাগারদ। শুধু ধারাবাহিক বঞ্চনার ইতিহাস। বদলোকটার একটা সামাজিক দায়িত্ব নেই? নৈতিকতার ধার ধারল না। লাগিয়ে দিল দাগ বন্দিনীর চরিত্রে। দুপুরবেলার হলুদ রোদে ভেজার গান না গাইলেই কি চলত না। কী দরকার ছিল পরকীয়ার অনাবশ্যক মোচড়ে।

নীতার ভাষা ধার করে আমিও বলতে পারি কিসের পরকীয়া কিসের আপনকিয়া। সব পুরুষের সৃষ্টি। দীপকচন্দ্র চিঠি ছাপিয়ে বে-আইনি বিয়ে করলে কিছু হয় না। আমি ঘোমটা খুললেই অনর্থ। অসতী অপবাদ। হোক, অকারণ সত্য জাহির করে বড়লোক হতে চাই না। সোনালি ঢাকনায় আবৃত অদরকারি সত্য। কী কাজ সব কিছু বলে দেওয়ার। শিল্প সাহিত্যে রহস্যই হল স্রষ্টার প্রতিরক্ষা। যা করার করেছি রহস্যের ঘোরটোপে।

চাঁদমামা বারবার গেছে পাতিপুকুর। আমার পাত্তি খসেছে তোড়া তোড়া। ঘনা বিল্টু ফটিকদের হপ্তা। কানা ফটিকের বাইরের ধাক্কায় ভাসুরের ঠেং খোঁড়া হতেই গেছি আর জি কর। মুদি তেজারতি ছোটভাই আর নতুন বৌ তো দেখতে যাওয়ার সময় দিল না। আগুন বড় সর্বনাশা।

লেখক জেঠুর মাথায় এত বুদ্ধি কোথায়। আমি সাজিয়ে দিয়েছি জীবনে আর কৃতজ্ঞ রাইটার লিখে গেছে দিস্তে দিস্তে। সাহেব বিবি গোলাম। আমি অকৃতজ্ঞ নই, ভ্রমর মিত্রের অণুপ্রেরণায় গড়েছি নিজেকে। গড়েছি সিনেমার মাপে, গল্পের সাজে। সাজতে সাজতে বিশ্বাস করেছি বঞ্চনার উত্তরাধিকার।

প্রতিদিন ধুয়ে মুছে চকচকে করে তুলে রেখেছি আমার তুলসীপাতা সাজ। লড়াকু মানবীর সাজে তো বেমানান হইনি। পুরুষের সমাজ থেকে একা লড়ে নিয়েছি অধিকার। কঠোর পরিশ্রমে শূন্য থেকে উপার্জন করেছি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান। সত্যের ফাঁকফোকর যদি

রহস্য দিয়ে ভরাট করে থাকি সে কৃতিত্ব আমার। দায় যদি কিছু থাকে সে বোকা পাঠকের আর দর্শকের। আমার সন্তানেরা রহস্য সন্ধানী নয়। ওরা জননীকে মা ব্যাঙের মতো আরও বড়ো আরও বড়ো দেখতে ভালোবাসে। তাই আমি যেখানে সিনেমা কনিষ্ঠা পারমিতা সেখানে আমার অনুরাগী দর্শক। হল ঘুরে সিটি বাজিয়ে ঘোষণা করে জননীগর্ব। বলে, বাও! তুমি আমার মা!

পালা লিখতে পারেনি চাঁদমামা। বলে, ক্যামেরার চোখ পিছিয়ে নিতে হয়। এত কাছে থেকে হয় না। তিনঘণ্টার পালায় একজীবনের সংঘাত সাজাতে পারে না। আমি তো পেরেছি। ভ্রমর মিত্র চাপান দিয়েছে দিস্তে দিস্তে। সিনেমার মার এককাঠি ওপরে। সংকেত সাজিতে সত্যের সোনামুখ ঢেকে দিয়েছে।

জেলের ভিতর বন্দিনীর পাগল হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ধরা যাক। অনুতাপের বেতন হতেই পারে মানসিক ভারসাম্যহীনতা। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করেছে ছায়াছবি। দেখিয়েছে গ্রামের দৃশ্য। আমার শিকড়। অকাল বোধন। ড্যামকুড়াকুড় কলাবউ এর নতমুখে বন্দিনীর প্রতিমামুখ।

আমাদের গ্রাম বিরাজপুরে পুজো আসত মহালয়ার রেডিওয়। যা দেবী সর্বভূতেষু। সিনেমা মায়া জানে। মুহূর্তে কেটে গেল মহাষ্টমী। নবমী নিশীথে দেখানো হল নাটকের আসর। মঞ্চে দ্রৌপদী স্থির বাসন্তী সাজে। বন্দিনীর শরীরী আভাস কুশীলবে। বৃদ্ধ নাগরিকের সংলাপে বুদ্ধিদীপ্ত সংকেত,

‘দ্যূতসবায় আপনাকে যারা নির্জিত করেন তারা ধৃতরাষ্ট্র বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। আর সেই দৃশ্য দেখে আচার্য দ্রোণ ছিলেন নিঃশব্দ। ধৃতরাষ্ট্র নতমুখে আর মহাত্মা ভীষ্ম বলেছিলেন ‘ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।’ কারো মুখে প্রতিবাদ ফোটেনি...’

সিনেমার চালাকি। নীতা বলেছে বুদ্ধদেব কবির নাটক। বুদ্ধিজীবী দর্শককে খেই ধরিয়ে দেওয়া। মানবীশক্তির অবমাননায় দ্রৌপদীর মতো উদাহরণ হয় না।

বিসর্জনের ঢাক কাঁসর বেজেছিল নদীর পারে। গ্রাম বিরাজপুরেও ছিল নদী। এঁকে বেঁকে ছুটে যাওয়া আদুরে মেয়ের মতো নদীর নাম শঙ্কাকুল। কীর্তনিয়া বাবা খোলকরতাল

হারমোনিয়ামের সুরে বিষাদমগ্ন গ্রাম ভাসিয়ে দিত চোখের জলের গানে। ‘মারে ভাসাইয়া জলে কী ধন লইয়া যাইমু ঘরে’।

সিনেমার দৃশ্যে এক ধুন্দমার হয়। ভাসানের প্রতিমা কাঠামো ভেঙে ওঠে আসে বন্দিনীর সাজে। অকাল ভাসান যে। বন্দিনী পাগল হয়। মিতা বলেছে ওই সিনটায় ক্লেপ পড়েছিল ফাটাফাটি।

নীতা ওসব ক্লেপ ফ্লেপের ধার ধারে না। নীতার রুক্ষতা তার কথায়। হুল ফুটিয়ে বিদ্ধ করে পুরুষকে। বলে, আমি মিতার মতো পারি না। বোকা মুক্তমনা নই। আমি নারীমনা। নারীকে পাগল করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। বলে, বই আর সিনেমা দুটোই মুদির দোকান। দর্শক পাঠকের মুখ চেয়ে থাকে। চোখের জল লিটার লিটার ঝরালেই না ঝনঝনাৎ। রয়্যালটি আর টিকিটঘর। বলে, বন্দিনীর স্বামীকে মেরে লেখক অন্যায় করেছে। লেখক নারী হলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত; ঘরদোর দখল নিত, খোরপোষ চাইত। বের করে দিত দুই বিয়ের শখ। বলে, আমি মানুষটাকে শারীরিক শাস্তি দিতাম। গায়ে গরম চা ঢেলে দিতাম। মারতাম না, রাতের বেলা ঘটিয়ে দিতাম অনর্থ। মেরে ফেলা মানেই তো চুকচুক। দুঃখ। পুরুষ মহত্ব।

আমি প্রমাদ গুনেছি। বলেছি, থাম। আমি তোর মা। পারিনি। আমার নারীত্ব বাধা দিয়েছে।

পুরুষ আর পিতার বিভাজন রেখায় দাঁড়িয়ে নীরব থেকেছে আত্মজা।

সিনেমা উপন্যাস রাজনীতির বাইরেও একটা পৃথিবী ছিল আমার। নীলের পুজো করেছি বছরের পর বছর। স্বপ্ন দেখেছি মিতার মতো। কৌশল্যার মতো শাশুড়ি চেয়েছি উমার মতো সোহাগী হতে চেয়েছি। দুর্বার মতো নত হইনি। অন্যরকম হয়েছি।

একলা মনের মানুষকে তো কেউ খোঁজে না। সবাই খোঁজে সমাজের মানুষ পরিবারের মানুষ। মাপে তার নিজের মাপের। হিংসার মাপে রিপুর মাপে। উঁচুতে ওঠে বিচার করে। দোষ দেখে, ছিদ্র খোঁজে। ছিদ্রহীন মানুষের খোঁজ পাবে না ভ্রমর মিত্র।

দোষ সবারই ছিল কিছু না কিছু। জনপ্রিয় লেখক বলে বন্দিনীর একহাতেই বাজিয়ে দিলেন তালি। ঘটনার তিল তাল হয়েছিল সত্য। স্বামীর গায়ে হাত তুলেছি। রাজনীতি করেছি রেগে।

তখন একটা পর্ব ছিল। দীপকচন্দ্র থেকে চাঁদমামার আকর্ষণ ছিল দুর্বার। তুমি তো বলেছিলে জেঠু, তুমি ম্যাজিক জান। তবে কেন সব ওলট পালট করে দিলে।

হিংসুটে লেখক আর এখন নেই। বেতালের মার খেয়ে কবেই মরেছে। শ্বশুর শাশুড়ি নেই অত্যাচার করার। বাবা নেই স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখার। দীপকচন্দ্র নেই ভাআলবেসে মরতে রাজি হওয়ার।

চাঁদমামা বেঁচে আছে আমার সংসারের যক্ষ হয়ে। দুই মেয়ের একজন বলে আমার জীবনী লিখবে। আর একজন সিনেমা করবে আমাকে নিয়ে। পালাকারও আশা ছাড়েনি। বলে লিখবে পালা বন্দিনী নাম্বার ওয়ান।

সংসারের আমার অনেক কাজ বাকি এখনও। আমি কোথাও নড়ছি না। আধিব্যাধি আছে, থাকুক। বন্দিনীর দুঃখে কাতর আমার মানসিক ব্যাধি তো সাময়িক। মেয়েরা বলে, ও কিছু না, স্নায়ুবিকার। তেমন লক্ষ্মণ দেখাআ দিলে আর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায় না ওরা। একজন পড়ে শোনায়, বিশ্লেষণ করে বন্দিনী উপন্যাস। মিতা বাড়িতেই নিয়ে আসে সিনেমা। কাঠামো ভেঙে উঠে আসা প্রতিমামুখ দেখিয়ে বলে, বাও! তুমি আমার মা!

*****

*('বন্দিনী কথা' গল্পটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে গল্পটি স্থান পায় লেখকের চতুর্থ গল্পসংকলন 'আসমান জমিন কথা' য়। গল্পসংকলন- আসমান জমিন কথা, জানুয়ারি ২০১১, একুশ শতক, কলকাতা,পৃষ্ঠা- ৮৩-৯৪।)

*গল্পটি, TDC,6SEM, BNG-HCC-602(B) বিশেষপত্র (ঐচ্ছিক) (খ) পূর্বোত্তর ভারতের বাংলা সাহিত্য (বিশেষপত্র) সিলেবাস এ রয়েছে। তাই পাঠকের সুবিধার্থে এখানে গল্পটি তুলে রাখলাম।

ধন্যবাদ। ---সুব্রতা মজুমদার। smazumdar07@gmail.com